একদিন দেশে ফিরে যাবো

আশীষ বাবলু

‘জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ২৫ বছর পড়াশুনা, পরের ২৫ বছর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, আর যদি ২৫ বছর বাঁচি তবে যা মনে চাইবে তাই করবো। দেশে গিয়ে জমিয়ে আড্ডা দেবো, গ্রামে গঞ্জে ঘুড়বো, নাটক দেখবো, কক্সবাজারের সমুদ্র তীরে বসে সমুদ্রের শোভা দেখবো।’ শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে কথাগুলো বললো ইঙ্গেলবার্নের আসিফ।

কথাটা মাটিতে পরার আগেই ছোঁ মেরে তুলে নিল ইফতেখার। ‘আপনি এ্যাকাউন্টেন্ট মানুষ। তবে মনে রাখবেন সব ব্যাপারে ডেভিড ক্রেডিটের হিসেব হয়না। জীবনকে অডিট করে লাভ নেই। আজকের জন্য বাঁচুন। মেইক মোস্ট অফ ইট নাউ।’

‘আপনি পারবেননা। কারন নানা রকম ব্যাবসা নিয়ে বসেছেন। কিন্তু অন্য কেউ সুখে বাকি জীবন কাটাক সেটাও চাইবেন না। এর জন্যইতো বলে বাঙ্গালি ইর্ষাকাতর।’ ফোরন কাটলো আসিফ।

‘আমি ইর্ষাকাতর নই। আপনি সুখে থাকুন এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে ঐ যে বললেন শেষ ২৫ বছর দেশে ফিরে গিয়ে আড্ডা, নাটক, কক্সেস বাজার..। সেটাতেই আপত্তি। কেননা সেটা সম্ভব হবেনা।’

‘দেশ সম্পর্কে কোনো অনুভুতি নেই আপনার? আপনি কি স্বপ্ন দেখেন না দেশের মাটি মেখে বাকি জীবন কাটানো?’ আসিফের চোখে মুখে দেশপ্রেম।

‘না’ বেশ জোরে উচ্চারন করলো ইফতেখার। ‘আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিনা। আপনাদের মতো দেশ দেশ করে মুখে ফ্যানা তুলিনা। এখানে চমৎকার আছি। এখানে যা রোজগার করি দেশে করতে হলে দুই নম্বরি করতে হতো। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাই, ছেলেপেলেরা সুশিক্ষা পেয়ে মানুষ হচ্ছে। জীবনে এর চাইতে ভাল থাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা।’

‘ভাল থাকা আর সুখে থাকা এক কথা নয়।’ বাংলা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বললো জিয়া। সে এতক্ষন পত্রিকা পড়ার ভান করে ওদের কথা শুনছিল।

‘আমিতো কোনো তফাত দেখিনা।’ ইফতেখার কাঁধ ঝাকালো।

জিয়া বললো, ‘ইফ্‌তেখার সাহেব আপনি কি ঠিক করেছেন কখনো দেশে ফিরে যাবেন না?’

‘নট এ্যাট অল। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশকে চিনি জিয়া। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি নিজের দেশ আপনাকে যা দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী এই দেশ আপনাকে দিয়েছে কিনা? এখন বছরে একবার যাই মা বেঁচে আছেন বলে। মা যদি এখানে চলে আসতো তবে আর দেশে যাবার কথা ভাবতামই না।’

‘আপনি কি মা ছাড়া, দেশে ফেলে আসা স্মৃতি, বন্ধু বান্ধব কিছুই কি আপনাকে টানে না?’ প্রশ্ন করলো জিয়া।

‘২৫ বছরে আমি যেমন বদলে গেছি, বন্ধু বান্ধব আত্মিয় স্বজনও বদলে গেছে। স্মৃতির কথা বলছেন? আমার স্কুলে একটা কাঠের শিড়ি ছিলো। সেই শিড়ি দিয়ে ধুমধাম আওয়াজ তুলে ক্লাসে যেতাম। এখানে আসার পর অনেক বার সেই কাঠের শিড়িটার স্বপ্ন দেখেছি। গতবার যখন দেশে গিয়েছিলাম ভাবলাম যাই একটু দেখে আসি। জীবনের আটটি বছর ঐ স্কুলটায় কেটেছে। কোথায় সেই কাঠের শিড়ি? দাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম- ভাই কাঠের শিড়ি

ভেঙ্গে সিমেন্টের শিড়িটা কবে হয়েছে? দাড়োয়ান এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো যেনো মঙ্গল গ্রহ থেকে একটা উটকো লোক সেখানে হাজির হয়েছে।' ইফতেখারের গলায় হতাশার সুর।

'আপনি কি মনে করেন চিরদিন কাঠের শিড়িই থাকবে? আপনি জানেন দেশে অনেক জননেতার বাথরুম আপনার সিডনির বেডরুমের চাইতে সুন্দর?'

'আপনার এই কথার সাথে আমি কোন তর্কে যাবোনা, খুবই সত্য কথা, আমি নিজে দেখেছি এবং ব্যাবহারও করেছি। বেশ আরামদায়ক। তবে কথা হচ্ছে এত কিছুর পরও দেশের মানুষ হাসতে ভুলে গেছে। কেউ হাসেনা, কি গরিব কি বড়লোক। সারা দেশ গম্ভীর মুখে ভরে গেছে।'

'মানুষ হাসুক আর নাই হাসুক আমিতো ভাই সুপারনিয়েশনের টাকাটা যেদিন তুলতে পারবো সেদিন সোজা দেশের টিকিট কাটবো, ওয়ান ওয়ে। এই দেশে অনেক হয়েছে, আর না।' আসিফ মুখ খুললো।

এতক্ষন মহিলাদের থেকে কোনো মন্তব্য আসছিল না। এবার আসিফের স্ত্রী লাভলী কারফিউ ভাঙ্গলো। আসিফের দিকে তাকিয়ে বললো-'এদেশের মেডিকেয়ার কার্ড কিন্তু বাংলাদেশে অচল। একটা বাইপাস অপারেশন হলেই সুপারনিয়েশনের ফান্ড ফিনিশ। ওষুধ কেনার পয়সা অবশিষ্ট থাকবে না।'

'এখানেই সমস্যা। আমিতো দেশে ফিরতে চাইছি, কিন্তু আমার স্ত্রী অষ্ট্রেলিয়ান মেম হয়ে গেছেন। বাংলা মায়ের এ্যাঙ্গলো মেয়ে।' আনিসের চোখে মুখে বিরক্তি।

'মোটেই না। আমি স্কুল মাষ্টারের মেয়ে। কঠোর অনুশাষনে বড় হয়েছি। বিয়ের পর ভেবেছি একটু হাত পা ছুড়ে বাঁচবো। ও বাবা, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে উঠে দেখি একান্নবর্তী পরিবার। এক ডজন চোখ সব সময় পাহাড়া দিচ্ছে। একটা নতুন শাড়ি পড়লে, কত দাম কোথাথেকে এলো না না প্রশ্ন। একটু নোনতা বিস্কুট খাবার ইচ্ছা হলে স্বামীর কাছে হাত পাততে হতো দশটা টাকার জন্য। স্বামীকে যে বলবো চলো আলাদা বাসা নিয়ে থাকি তাও বলতে পারতামনা। একডজন চোখ বলবে বউ এসে সংসার ভেঙ্গেছে। এখন এখানে চাকুরি করি, যখন ইচ্ছা নতুন শাড়ি পড়ি। শুধু নিজে কেনো? সমস্ত ইঙ্গেলবার্নের বাঙ্গালীদের নোনতা বিস্কুট খাওয়াতে পারি। স্বামীর কাছে হাত পাততে হবেনা।' এক নিঃস্বাসে কথা গুলো বলে গেলো লাভলী।

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া সবাই শুনতে ভালবাসে। একটু উস্‌কে দেবার জন্য জিয়া বললো-' টাকা রোজগারের কথা বলছেন, দেশেওতো চাকুরী করতে পারতেন?'

'আমার মতো বি,এ ফেল মেয়েকে কে চাকুরি দেবে? এখানে কোলস্ এ চাকুরি করি। এখানে দেশের মতো কেউ নাক শিটকায় না, ওমা বাড়ীর বউ ডিম রুটি বিক্রি করছে।' লাভলীর কথায় উপস্থিত সবাই শব্দ করে হেসে ফেললো।'

এবার সবার দৃষ্টি পড়লো উপস্থিত অন্য মহিলাটির দিকে। উনি হচ্ছেন ইফতেখারের স্ত্রী রেহানা। 'রেহানা আপনি কি ভাবছেন দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারে?'

'আমি যখন এদেশে এসেছি তখন ছেলের বয়স মাত্র তিন বছর। সেই হিসাবে আমার বয়সও খুব একটা বেশী ছিলনা। এদেশের পরিছন্ন রাস্তাঘাট, সুন্দর ফ্লাটবাড়ী, শপিং সেন্টার, অপেরা হাউসের পাশে সমুদ্র খুবই আকৃস্ট করতো। প্রায় প্রতিদিন আব্বা আম্মাকে ফোন করতাম আর উচ্ছাসে সিডনির গল্প করতাম। প্রত্যেক মাসে ছবি পাঠাতাম, ছেলের স্কুল ড্রেস পড়া ছবি, ক্লাসের বন্ধুদের সাথে ছবি, অপেরা হাউসের পাশে দাড়িয়ে ছবি। মনে আছে ইফতেখার একদিন হঠাৎ করে বাজার থেকে একটা লাউ নিয়ে এসে হাজির, সেই লাউ হাতে ছবি তুলে পাঠিয়েছি। সেই সব দিন গুলোর কথা মনে হলে বুঝতে পারি দেশ থেকে এতদূড়ে এসেও কি একটা আন্তরিক যোগাযোগ ছিল

দেশের সাথে। তারপর আমিও এখানে উপার্জনের জন্য চাইল্ড কেয়ার শুরু করলাম। ব্যাস্ততার কারনে ধীরে ধীরে কমতে থাকলো যোগাযোগ। বড় ধাক্কাটা খেলাম যখন আব্বা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আব্বার সাথে আমার ছিল বন্ধুর মত সম্পর্ক। এখন আম্মা আছেন অসুস্থ শয্যাশায়ী। গতবছর দেশে গিয়েছিলাম ননদের খোঁচা মেরে কথা ভাল লাগেনি। এই বয়সে খোঁচা সহ্য করার ধর্য্য নাই। বুঝতে পারছি আম্মা চলে গেলে দেশের সাথে সম্পর্ক অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে। ’ এই পর্যন্ত বলে ছল ছল চোখে থামলো রেহানা।

‘তার অর্থ হচ্ছে আপনারও দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই?’ আবার প্রশ্ন করলো জিয়া।

‘ইচ্ছে থাকলেও দেশ এখন আর আমাদের আপন করে নিতে চাইছেনা। আত্মিয় স্বজনরা ভাবে সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছি। বন্ধু বান্ধবরা ভাবে তাদের সুখে ভাগ বসাতে এসেছি। মুরুব্বিরা বলেন দেশের পরিবেশ তোদের সহ্য হবেনা। দেশে গিয়ে কিছুদিন দাওয়াত, দেখা সাক্ষাত ভালই কাটে, তারপর সবাই নিজেদের ব্যস্ততায় মুখ ঘুড়িয়ে নেয়। ভাবখানা এই, একমাস হতে চলছে এবার কেটে পরো। ছেলেটাকেই নিয়েই একটু চিন্তা। লাজুক স্বভাবের হয়েছে। আমার ইচ্ছা দেশের একটা মেয়ে এনে ওকে বিয়ে দেবো। ও পরিস্কার বাংলা বলে।’ রেহানা এই পর্য্যন্ত বলে থামলো।

‘এই কাজটা কি ঠিক হবে?’ আসিফ এই কথা উচ্চারন করেই নিরব হয়ে গেলো । একটু আমতা আমতা করে বললো- ‘ আপনার ছেলে বাংলা বলতে পারে খুবই আনন্দেও কথা। কিন্তু ওর আচরন, চিন্তা ভাবনা, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, দেশে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের থেকে কিন্তু ভিন্ন। ওকে যদি দেশের কামরুন্নেসা ইস্কুলে পড়া একটি মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় তবে কিন্তু বিপদের কথা। বিবাহিত জীবনে ভাষার মিলের চাইতেও মনের মিলের বেশী প্রয়োজন।’ আসিফ এই পর্য্যন্ত বলে থেমে গেল।

‘বরং এখানে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা পরস্পরে বিয়ে করলে টেম্পারমেন্টে মিলবে।’ যোগ করলো জিয়া।

‘এখানে ছেলেমেয়েরা একে অপরের সাথে মিলবে তার রাস্তা কোথায়?’ বেশ শক্ত ভাবে প্রশ্ন রাখলো ইফতেখার। তারপর নিজেই বলতে শুরু করলো - ‘বাঙ্গালী এসোসিয়েশন গুলোতো আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খুচরা পয়সা বানিয়ে ফেলেছি। দলাদলির কারনে সবাই সব অনুষ্ঠানে যেতে পারেনা। ছেলেমেয়েরা যদিবা যায় দুড়ে দাড়িয়ে থাকে। দর্শক হিসাবে। বাংলা গান, কবিতা ওদের খুব একটা ভালও লাগেনা।’

‘আমার মনে হয়কি জানেন?’ বললো জিয়া - ‘ এখানে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের এখানকার অনুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া উচিত। ওরা ইংরেজীতে বলুক, ইংরেজীতে গান বা নাটক করুক, তাতে অসুবিধা কি? এভাবে মিশতে মিশতে বাংলা সংস্কৃতির উপরও একটা ভালবাসা জন্মাবে। বাংলা পত্রিকাতেও ওদের দিয়ে ইংরেজীতে লেখানো উচিত, তবেই ওরা বাংলা পত্রিকাও নেড়েচেড়ে দেখবে।’

একটু হতাশ ভঙ্গিতে ইফতেখার বললো ‘ আমাদেও মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মেছে বাংলার বাইড়ে উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দি যাই হবে তাই অপসংস্কৃতি। এরা সব নিচু জাতের।’

কথাবার্তা একটু অন্যদিকে মোর নিল। আসিফ বললো,- ‘তবে যাই বলুন, এখানে বড় হয়ে ওঠা আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যবান। এই নুতন প্রজন্ম কত সহযেই পেয়েছে এদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যাবস্থার এবং উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ। মনে আছে ছোট মেয়ের বয়স যখন চার তখন ওকে ভাল ইস্কুলে ভর্তি করার জন্য ঢাকায় কত নেতা নেত্রীর বাসায় ধর্না দিতে হয়েছিল। দেশে ভাল ইস্কুল কলেজের খুবই অভাব।’

‘অভাব ছিলনা। আমরাই ভাল রাখতে পারিনি।’ ইফতেখারের গলায় অভিযোগ। ‘বরিশালের ব্রজমোহন ইনিষ্টিটিউশনের কথাই ধরুন, ঐ কলেজের এককালে এত নাম ডাক ছিল যে অধ্যাপক ক্যানিংহাম বলেছিলেন -

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত উৎকৃষ্ট মহাবিদ্যালয় থাকতে বাঙ্গালী ছাত্ররা বিদ্যা শিক্ষার জন্য কেন অক্সফোর্ডে যায় আমি বুঝতে পারিনা।'

'ইফতেখার যে ব্রজমোহনের ছাত্র তাতো বোঝাই যাচ্ছে। নিজের ছেলে মেয়েদের এখানে প্রাইভেট স্কুলে পড়াচ্ছে।' জিয়ার মুখে মুচ্‌কি হাসি।

'শুধু কি প্রাইভেট স্কুল,ওরা দুইখানা বাড়ীর মালিকও হবে ভবিষ্যতে।' আসিফ যোগ করে।

ইফতেখারের মনে হয় এই মন্তব্য শুনে খুব একটা ভাল লগেনি। বললো -'তোমাদের ছেলে মেয়েদের জন্যও কম রেখে যাচ্ছনা। সেদিন বড় ছেলেকে নিয়ে রাত ১২টার সময় বাসায় ফিরছিলাম। দেখলাম বাংলাদেশের বেশ ক'জন স্টুডেন্ট সম্ভবত রেষ্টুওেন্টে কাজ শেষ করে ঘরে ফিরছে। ছেলেকে বললাম,- দেখো একটু উচ্চ শিক্ষার জন্য, একটু পায়ের তলায় মাটি পাবার জন্য কি পরিশ্রম ওরা করছে। তোমরাতো এসব কত সহযেই পেয়ে গেছো। তবে ভুলে যেওনা, তোমাদের মা বাবারও এমন ভাবে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে। আমি টেক্সি চালিয়ে মাঝ রাতে ঘরে ফিরতাম, তোমার মা জানলার পাশে দাড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতো।'

এই আলোচনা আরো অনেকটা সময় চলেছে। সবটা লেখা এই অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। ইমিগ্রেন্টদের ইতিহাস সত্যি বড় নিষ্ঠুর ইতিহাস। একটু সুখ একটু সাচ্ছন্দের হাতছানিতে ছুটে আসতে হচ্ছে শিকড় উপরে। দেশ, মাটি, প্রিয়জন সবাইকে পেছনে ফেলে। আমাদের মাতৃভূমির ''মা'' এখন কিছু আমলা, অসাধু ব্যাবসায়ী, মন্ত্রী মিনিষ্টারেরই মা হয়েছেন। আম জনতার দিকে ফিরে তাকাবার সময় সে মায়ের নেই। আমরা দুরদেশে ফেলে আসা দেশটার স্মৃতি হাতড়িয়ে, তার সাথে স্বপ্নের জাল বুনে, বুকের হাহাকার নিরসনের চেষ্টা করি। স্বপ্ন দেখি, একদিন দেশে ফিরে যাবো।

প্রত্যেক মানুষের দেশ প্রেমের একটা আলাদা ষ্টাইল আছে। কেউ উচ্চস্বরে, কেউ নিঃশ্বব্দে, কেউ হালকা হাসিতে দেশপ্রেম প্রকাশ করে। আজকের এই আড্ডায় প্রত্যেকটি মানুষের (যদিও নামগুলো আমি সঠিক লিখিনি) দেশপ্রেম প্রশ্নাতিত। ইফতেখারের কথাবার্তায় মনে হবে তা'র দেশের প্রতি এতটুকু ভালবাসা নেই। তাই যদি হবে, এদেশে ২৫ বছর থাকার পরও ইস্কুলের কাঠের শিড়ির স্বপ্ন সে ঘুমের মধ্যে দেখে কেনো?

তবে লক্ষ্য করেছি মেয়েদের চাইতে ছেলেরাই বেশী নষ্টালজিক। বাল্য ও কৈশরের স্মৃতি তাদেরই বেশী কষ্ট দেয়। হয়তো মেয়েদেরও দেয়, হাত পা নাড়িয়ে ছেলেদের মত প্রকাশ করেনা। স্বভাবে চাপা বলে একটা সুনামতো তাদের রয়েছেই। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে? একদিন দেশে ফিরে যাবো, এমন একটা স্বপ্ন মনের মধ্যে লালন করে পরবাসে জীবন কাটানো নেহাত মন্দ না। গায়ক সুমনের ভাষায় বলা যায়, স্বপ্ন দেখার স্বভাব আমার এখনো গেলোনা।

***